মুঘলদের সেনাবাহিনী-১

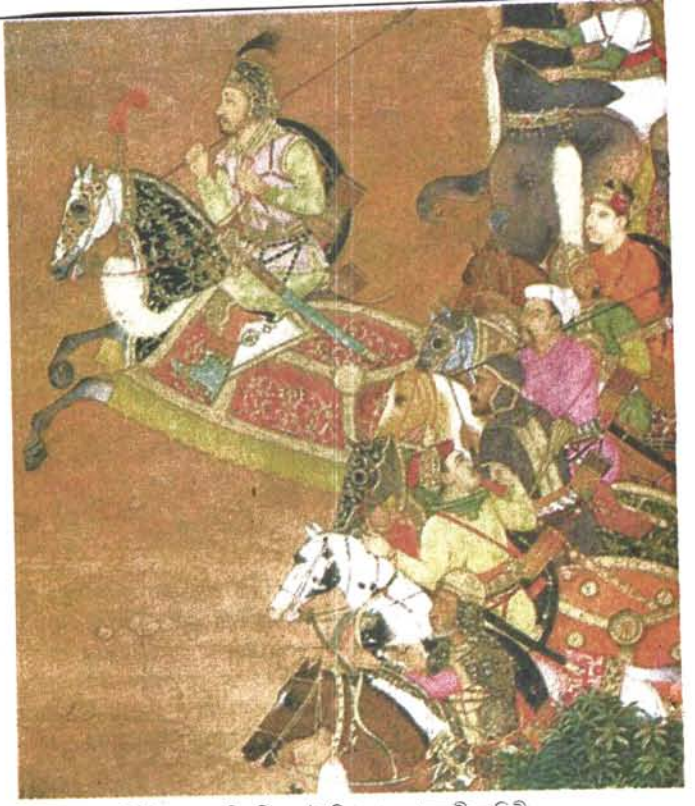

মুঘল সেনাবাহিনীর মূল শক্তি ছিল এই রিসালা অশ্বারোহী বাহিনী

● শানজিদ অর্ণব

মধ্যযুগে তলোয়ারই ছিল শাসন ক্ষমতার নিয়ামক। মুঘলরাও এ থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না। মুঘলদের ভাগ্য নির্ধারিত হতো তাদের সেনাবাহিনীর গুণগত মানের ওপরই। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ বাবর পানিপথে বিশাল আফগান বাহিনীকে হারিয়েছিলেন নিজের খুবই ছোট এক সেনাবাহিনী দিয়ে। ছোট হলেও তার সেনাবাহিনী ছিল অসীম সাহসী আর সমর বিদ্যায় কুশলী। মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এর সেনাবাহিনীর আকারও বাড়তে থাকে। আওরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর এ আকার বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা দ্রুত অগ্রসরে অক্ষম এক ভারবাহী ঢাউস জনবলে পরিণত হয়। এটা মুঘল সেনাবাহিনীর কর্মক্ষমতা হ্রাস করেছিল।

বাবরের পুত্র হুমায়ুন কনৌজে নিজের অপেক্ষাকৃত বড় সেনাবাহিনী নিয়ে হেরেছিলেন ছোট আফগান বাহিনীর কাছে। কিন্তু এই হুমায়ুনই যখন আবার সেই আফগানদেরই হারান তখন তার

মুঘল পদাতিক সেনা

সেনাবাহিনী ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। অর্থাৎ, সুশৃঙ্খল ছোট এবং সাহসী সেনাবাহিনী প্রতিপক্ষ বিশাল সেনাবাহিনীকে হারাতে এবং নির্মূল করতে সক্ষম।

বাদশাহ বাবর তার সেনাবাহিনীকে নিজে সরাসরি নির্দেশনা দিয়ে পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু আকবর বা তার পরবর্তী শাসকদের কারো পক্ষেই সেটা সম্ভব হয়নি। এর কারণ ছিল সেনাবাহিনীর বিশালতা। আকবর নিজে সেনাবাহিনীর অনেক সংস্কার করলেও সেনাবাহিনীতে ক্রমানুযায়ী পদ এবং ক্ষমতার বিন্যাস তিনি করেনি। এর পরিবর্তে তিনি সেনাবাহিনীকে ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত রাখতেন। মনসাবদারদের দায়িত্ব ছিল এসব ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন নিয়োগ করা। যুদ্ধের সময় এ ইউনিটগুলোকে এক জায়গায় আনা হতো। তবে কখনই এদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনীতে পরিণত করা হয়নি।

মুঘল সেনাবাহিনীর কোনো সাধারণ পোশাক ছিল না। সাধারণ অনুশীলন বা যুদ্ধ কৌশলেরও কোনো বালাই ছিল না। প্রত্যেক জাতি তাদের ইউনিট নিয়ে নিজেদের মতো করে লড়াই করত। যেমন- আফগানরা আফগান নেতার অধীন, রাজপুতরা তাদের নিজস্ব নেতার অধীন। প্রত্যেকেই তাদের ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুসারে যুদ্ধ করত এবং তাদের নিজস্ব অস্ত্র ব্যবহার করত। ফলে মুঘলদের কোনো একটি একক সেনাবাহিনী ছিল– এমনটা বলা যায় না বরং তাদের ছিল বিভিন্ন সেনাদলের একটি পুঞ্জীভূত ভাণ্ডার।

মুঘল সেনাবাহিনীর আরেকটি দুর্বলতা ছিল তাদের অনেক সেনা অধিনায়কই সার্বক্ষণিক কর্মরত থাকতেন না। অনেক ক্ষেত্রে এমনকি তারা যোদ্ধাও ছিলেন না। যুদ্ধের সময় কবি, ডাক্তার বা অন্যান্য পেশার মানুষকেও যুদ্ধে নামতে হতো। সেনা ইউনিটের নেতৃত্ব নিয়ে আমিরদের মধ্যে রেষারেষি ছিল। যুদ্ধের সময় ছোট ছোট সেনাদলকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো সেনা অধিনায়কেরও অভাব ছিল। ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার একজন অধিনায়কের অধীন থাকত ৫ হাজার সৈন্য। ফলে তার পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে এ বিপুল সেনাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো না। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা অধিনায়কের মৃত্যু হলে পরবর্তী নেতা নির্দিষ্ট থাকত না। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত।

মুঘল সেনাবাহিনীর বিভাগ ছিল চারটি– রিসালা, পদাতিক, গোলন্দাজ এবং হস্তি বাহিনী। এদের মধ্যে রিসালা, পদাতিক এবং হস্তি বাহিনী মনসাবদারদের মধ্যে ইচ্ছেমতো ভাগ করে দেয়া হতো। কিন্তু গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য থাকত নির্দিষ্ট বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা অধিনায়ক। গোলন্দাজ ইউনিটের প্রধানের পদ ছিল 'মীর অতিশ'। সেনাবাহিনীর একটি কেন্দ্রীয় অংশ থাকত, যা সম্রাট সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরবর্তী পর্যায়ের বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতেন মনসাবদার এবং রাজাগণ। আর স্থানীয় মিলিশিয়া পরিচালনা করতেন জমিদাররা।

মুঘল সেনাবাহিনীর মূল শক্তি ছিল কেন্দ্রীয় রিসালা বা অশ্বারোহী ইউনিট। সম্রাট আকবরের সময় এই ইউনিটে ছিল প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য। এ ইউনিটে থাকত আবার আরেকটি কেন্দ্র, যারা ছিলেন সম্রাটের বিশ্বস্ত এবং সমর কুশল সৈন্যদের নিয়ে গঠিত। তারা সব সময় সামরিক প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে যে কোনো সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এই সেনাদের বলা হতো 'আহাদিস'।

কেন্দ্রীয় ইউনিটের সৈন্য এবং অধিনায়কদের সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করা হতো। তাদের চারিত্রিক সাধুতার জন্য অবশ্যই কোনো জামিন হাজির করতে হতো। এই বাহিনীর রিসালাদের নিজস্ব তুর্কি ঘোড়া থাকতে হতো। কারণ ভারতের ঘোড়া ছিল ভীরু এবং অশান্ত প্রকৃতির। আকবরের সময় ঘোড়াদের সাতটি ভাগে ভাগ করা হতো– আরব, পারসি, মুজান্না, তুর্কি, ইয়াবু, তাজিস এবং জংলী ঘোড়া। আরব ঘোড়া ছিল সেরা।

মনসাবদারদের প্রতিও নির্দেশ ছিল তারা যাতে সতর্কতার সঙ্গে সেনা নিয়োগ দেন। কিন্তু অনেক সময়ই তারা চাকরদের সৈন্য সাজিয়ে আনতেন বা অন্যের ঘোড়া ধার নিয়ে আসতেন। এ চতুরতা বন্ধ করতে সম্রাট আকবর ঘোড়ার গায়ে চিহ্ন দেয়ার বিধান চালু করেন, যা তার উত্তরসূরিরাও অনুসরণ করেছেন। আকবর তার রাজত্বের অষ্টাদশ

মুঘল সেনাবাহিনীর হস্তী বাহিনী

বছরে এই চিহ্ন দেয়ার বিধান চালু করেন। রিসালা বাহিনী ছিল মুঘলদের এলিট ফোর্স। তাই এই বাহিনীর সৈন্য এবং ঘোড়ার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা হতো। প্রতিবছর কাবুল, বুখারা এবং বাল্ক থেকে প্রায় এক লাখ ঘোড়া আমদানি করা হতো।

পদাতিক সেনাদের মর্যাদা ছিল কম। পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করাটা সে সময় খুব একটা সম্মানজনক বলে বিবেচিত হতো না। তাই কেউই পদাতিক বাহিনীতে কাজ করতে আগ্রহী হতেন না। তাই মুটে, পানিবাহক, ডাক বহনকারী– এমন সব পেশার মানুষদের দিয়ে তৈরি হতো পদাতিক বাহিনী।

মুঘল-ভারতের সাধারণ অস্ত্র ছিল তলোয়ার, বর্শা এবং তীর-ধনুক। শূল বা বর্শা ছিল রাজপুতদের প্রিয় অস্ত্র। বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করা সৈন্যদের কোনো সম্মান ছিল না মুঘল-ভারতে। ভারতে যুদ্ধ হতো তলোয়ার আর বর্শা দিয়ে। আর মিসাইল বলতে ছিল তীর। তবে ধীর ধীরে মাসকেট গান এবং কামানের ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু তা কখনই তলোয়ার, বর্শার মর্যাদা নিতে পারেনি। কামান এবং মাসকেট গান বাবরই প্রথমবারের মতো ভারতে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেন। বাবরের বর্ণনায় জানা যায়, ভারতের অনেক এলাকার মানুষ তখনো বন্দুক দেখেনি। বন্দুককে তারা অত্যন্ত ভয় পেত। বন্দুক নিয়ে সম্রাট আকবরের বেশ আগ্রহ ছিল। তার পৃষ্ঠপোষকতায় হাকিম ফাতহুল্লাহ শিরাজি দুই নলের কামান আবিষ্কার করেছিলেন। আকবর এমন এক ধরনের বন্দুক তৈরি করিয়েছিলেন, যা কয়েক টুকরোয় ভাগ করা যায় এবং দরকার মতো জুড়ে নেয়া যায়। নিঃসন্দেহে এটা ছিল সে আমলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গোলন্দাজ অভিযানের একটি পরিচালনা করেছিলেন শাহজাদা দারাশিকো। কান্দাহার অভিযানে তার সঙ্গে ছিল ত্রিশ হাজার কামানের গোলা, এক লাখ সাতাশি হাজার কিলোগ্রাম বারুদ, তিরানব্বই হাজার কিলোগ্রাম লেড এবং এক হাজার চারশত রকেট। কিন্তু এই বিপুল গোলাবারুদ নিয়েও দারা কান্দাহার দখলে নিতে পারেননি। কারণ, তখনও এ অঞ্চলে যুদ্ধের নির্ণায়ক ছিল রিসালা বাহিনী। কিন্তু তারপরও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আগ্রহ ছিল মুঘল সম্রাটদের। এ বাহিনী সরাসরি সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে থাকত। গোলন্দাজ বাহিনীর সদস্যদের বেতনও ছিল ভালো। মানুচ্চি শাহজাহানের গোলন্দাজ বাহিনীতে মাসে বেতন পেতেন ৮০ রুপি। দারা তার বেতন বাড়িয়ে করেন দেড়শ রুপি। আওরঙ্গজেব ইউরোপীয় গোলন্দাজদের বেতন নির্ধারণ করেন দিনে চার রুপি। যুদ্ধে গোলাবারুদের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে কমতে থাকে ভারতের যুদ্ধের ট্যাঙ্ক বলে খ্যাত হাতির ব্যবহার। কারণ হাতি বন্দুক বা কামানের শব্দে ভয় পায়। আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী ভারতে এসে প্রথমবারের মতো হাতি দেখেছিল। সেই হাতি দর্শন তাদের জন্য মোটেও সুখকর হয়নি। তাদের ঘোড়া সেই বিরাট প্রাণীটিকে দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল। মুঘলরাও ভারতে এসে হাতির ব্যবহার দেখে। আকবরের হাতি সংগ্রহের নেশা ছিল। আকবরের সংগ্রহে ছিল ৫ হাজার হাতি। যার মধ্যে তার নিজের সংগ্রহশালায় ছিল একশ হাতি, যাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম ছিল। আকবরের হাতির পাল চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এক. ভাদ্দার, যাকে হিন্দিতে বলা হতো গজ মানিক, দুই. মান্দ, যা ছিল বন্য প্রকৃতির, তিন. মির্গ এবং চার. মির। (চলবে) ■

তথ্যসূত্র :

আবুল ফজল, আইন-ই আকবরী, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১০।

আব্রাহাম এরালি, দ্য মুঘল ওয়ার্ল্ড: লাইফ ইন ইন্ডিয়া'স লাস্ট গোল্ডেন এজ, পেঙ্গুইন বুকস, নয়াদিল্লি, ২০০৭

পরিবেশ বান্ধব অভিজাত ফ্ল্যাট

গেন্ডারিয়া ■
বাড্ডা ■
উত্তরা ■
খিলগাঁও ■
শ্যামলী ■
শেওড়াপাড়া ■
বাইতুল আমান হাউজিং ■
মিরপুর ■
কাকরাইল ■
স্বামীবাগ ■
মালিবাগ ■
(কমার্শিয়াল) উত্তরা ■

রাজউক অনুমোদিত

উদ্ভাসিত আগামীতে আপনার আস্থা

বিল্ডিং ফর ফিউচার লিঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ গগন শিরিষ, (৩য় ও ৪র্থ তলা), ৭৬ ও ৭৬/১, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ +৮৮০-২-৮১৫৯১০৪, +৮৮০-২-৮১৫৯৮৮৮, +৮৮-০১৯১২৭৮৬৫৩০
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-২-৯১৩৭৪৫৩, ই-মেইল ঃ sales@buildingforfutureltd.com
www.buildingforfutureltd.com

হট লাইন : +৮৮-০১৭৭৬৪৬৩০০৭, +৮৮-০১৫৫২৪১৪৩০৩

munsur007/shp00/may14